একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

৫০৫ সংখ্যা ভাদ্র ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮০৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ শ্রাবন রবিবার ৫৬ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

আচার্য্যের উপদেশ।

জ্ঞান দ্বারা, হৃদয় দ্বারা, আত্মা দ্বারা, সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করা, হৃদয়ের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত মঙ্গল-কার্য্য সাধন করা, তিনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রথম জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করা। ধ্যানই আত্মার চক্ষু। আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা পরমাত্মাকে ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" তিনি সত্য-স্বরূপ অর্থাৎ সকল সত্যের মূল-সত্য। যাহা জ্ঞানে প্রকাশ পায় তাহাই সত্য—সুতরাং সত্যের মূল জ্ঞানেতেই অন্বেষিতব্য। বিষয়-সকল জ্ঞানেতে প্রকাশ পায় বলিয়া তাহারা যদি সত্য নামের যোগ্য হইল, তবে স্বয়ং জ্ঞান কত না সত্য। আমার জ্ঞান না থাকিলে আমার নিকট সত্য বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না,—মূলে জ্ঞান না থাকিলে কাহারো নিকটে কোন সত্যই থাকিতে পারে না; অতএব যিনি মূল-সত্য তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি জড়জগতের ন্যায় সত্যের প্রতিরূপ নহেন—তিনি সত্যের স্বরূপ,—জগতের প্রকাশ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হ'ন না—তাঁহারই প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎ অনুপ্রকাশিত হইতেছে,—ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো-ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্রতারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে। সমস্ত জগৎ তাঁহারই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার প্রকাশেই সমুদায় প্রকাশ পাইতেছে।" জগতের ন্যায় তিনি ছায়া-সত্য নহেন—তিনি জ্ঞান-পূর্ণ প্রেম-পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মূল সত্য—তিনি জাগ্রত জীবন্ত পরমাত্মা। জগতের মূলে একমাত্র তিনিই কেবল বর্ত্তমান তদ্ভিন্ন এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই যাহা তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ক-

রিতে পারে বা বিচলিত করিতে পারে—তিনি আকাশে অপরিচ্ছিন্ন কালে অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম। এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যখন আমাদের ধ্যাননেত্রে প্রকাশিত হ'ন—তখন সর্ব্বাঙ্গীন সত্য অবলোকন করিয়া আমাদের জ্ঞান পরম চরিতার্থতা লাভ করে।

দ্বিতীয়, হৃদয় দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা। জ্ঞান না থাকিলে যেমন কোন সত্যই থাকিতে পারে না, প্রাণ না থাকিলে সেইরূপ কোন সৌন্দর্য্যই থাকিতে পারে না। প্রাণ যাহা চায় তাহাই সুন্দর। প্রাণ চায়—প্রাণের আবির্ভাব,—তাহাই সুন্দর,—জীবন্ত সত্যই সুন্দর। প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। ইনি প্রাণ-স্বরূপ যিনি এই সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আমরা কেবল জ্ঞানের কথা শুনিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারি না—প্রাণের কথা শুনিলে তবে আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। যিনি প্রাণের সহিত সম্পর্কশূন্য শুষ্ক জ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহার সে জ্ঞান অঙ্গহীন—তাহাতে সত্যের কেবল একদিক্ প্রকাশ পায়, আর এক দিক্ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;—এইরূপ প্রাণশূন্য জ্ঞানের অনুশীলন হইতেই নিরীশ্বর বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সকল জন্ম গ্রহণ করে,—তাহাদের মস্তকই তাহাদের শরীরের অর্দ্ধভাগ—হৃদয়ের স্থান অল্প। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "প্রিয়মুপাসীত"—পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। "স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখন মরণশীল হ'ন না। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া যেমন বলিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম," প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেইরূপ বলিয়াছেন "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে তাঁহারা উদাসীনের ন্যায় দেখিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত প্রীতি করিতেন; তাঁহারা বলিয়াছেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।" এত জোরের কথা কখনই মুখের কথা নহে—মুখের কথাও নহে—শুধু কেবল মনের কথাও নহে—অভিলাষ মাত্র নহে,—উহা প্রাণের কথা। প্রাণ যাহা চায় তাহাই আমাদের প্রিয়তম বস্তু, আমাদের প্রাণ যেখানে অবাধে স্ফূর্ত্তি পায় তাহাই আমাদের আনন্দের আলয়! আমাদের শারীরিক প্রাণ যেমন আপনার স্ফূর্ত্তির জন্য বিষয়ক্ষেত্র চায়, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাণ সেইরূপ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমাত্মাকে চায়। শারীরিক প্রাণক্রিয়া অন্ধ-প্রকৃতি, আত্মার প্রাণ-ক্রিয়া চিন্ময় আনন্দ; কোন নশ্বর বস্তুই সে আনন্দকে কুলাইয়া উঠিতে পারে না,—তাহার জীবিকা যোগাইতে পারে না, সে আনন্দ চায় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি" তাহা ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি মানে না। জড় জগতের সৌন্দর্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয় সমস্তে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে আমাদের আত্মাতে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয়—আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়। জ্ঞানেতে স্বয়ম্ভু মহান্ পুরুষকে ধ্যান করিয়া তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ করিলে আত্মা যে এক সুগভীর

প্রশান্ত আনন্দ-রস উপভোগ করে, তাহা সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ অমৃত স্বরূপ,—তাহাতে মৃত্যুর সংস্পর্শ মাত্র নাই।

তৃতীয়, আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া মঙ্গল-কার্য্য সাধন করা। পরমেশ্বর স্বয়ং যেমন সকল মঙ্গলের পরম মঙ্গল, তাঁহার কার্য্য সেইরূপ সকল মঙ্গল-কার্য্যের পরম আদর্শ। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর প্রশান্ত অক্ষুব্ধ এবং অতন্দ্রিত ভাবে সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন; শান্তং শিবং অদ্বৈতং তিনি শান্ত মঙ্গল এবং অদ্বিতীয়। এই মহান্ আদর্শকে চক্ষে রাখিয়া আমরা যেন স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। প্রথমতঃ মনকে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে নিরস্ত করিয়া তাহাকে প্রশান্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রশান্ত হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে, মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; এইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য—যেন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের এক আত্মাই আমাদের সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় মূল-প্রবর্ত্তক, সমস্ত ইন্দ্রিয় একমাত্র আত্মারই আজ্ঞাবহ ভৃত্য। এইরূপে জ্ঞান দ্বারা হৃদয় দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা আমরা যদি ঈশ্বরের উপাসনাতে দিন দিন নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে কালের রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা কালের হস্ত এড়াইতে পারি—এবং ঈশ্বরের আনন্দময় সহবাসে ইহ জীবনেই মুক্তির অমৃত নিকেতনে বিচরণ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! আমাদের মোহ-অন্ধকারে তোমার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ কর, আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার প্রেমামৃত বর্ষণ কর, আমাদের আত্মাতে তোমার অপরাজিত শক্তি সঞ্চারিত কর। যাহাতে আমরা সংসারের সমুদায় মোহ-শোক ভয় বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোমার আনন্দময় সহবাসে কৃত-কৃতার্থ হইতে পারি—তুমি আমাদের আত্মাতে সেইরূপ মধুময় প্রাণের সঞ্চার কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সমালোচনা।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্য ভারতে পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত "ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ" এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পক্ষপাতীদিগকে কিরূপে নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতা-পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তাহা শাস্ত্রী-মহাশয়ের ঐ প্রবন্ধটিতে সুন্দর-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির দুই স্থান একটু অসাবধানে লিখিত হইয়াছে—তাহা আমরা পরে দেখাইব; কিন্তু সাকল্যে—প্রবন্ধটি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই (বিশেষতঃ ইংরাজি বিজ্ঞানপ্রিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের) সুপাঠ্য সুফল-প্রদ ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, ইহাতে আর সংশয়-মাত্র নাই। প্রবন্ধটির ভাষা এবং ভাব উভয়ই নির্ম্মল নির্ঝরিনীর ন্যায় এমনি সহজ-ভাবে হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চলিয়াছে যে, তাহাতে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই মন সদ্য ঈশ্বরাভিমুখে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এই প্রবন্ধটির জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি এবং আশা করি—মধ্যে মধ্যে তিনি এইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক এবং প্রেমামৃত বর্ষণে দেশীয় জন-সাধারণের মনঃ-প্রাণ শীতল করিয়া আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির সার্থক্য সম্পাদন করিতে থাকেন।

যে দুই স্থানের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর আমাদের আপত্তি

শুধু এই যে, তাহার যুক্তি-প্রণালী তেমন পাকা হয় নাই—নচেৎ তাহার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্যের সহিত আমাদের মতের কোন অনৈক্য নাই।

প্রথম ;—শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের দেশের ন্যায়-শাস্ত্রের মতানুবর্ত্তী হইয়া যুক্তি দ্বারা এইটি সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে

"কার্য্যের গুণাবলী কারণের গুণাবলীর অনুসারী হইয়া থাকে।"

এবং সেই দুর্ব্বল যুক্তিটির স্কন্ধে তিনি এই গুরুতর সিদ্ধান্তটির প্রমাণের ভার চাপাইয়াছেন যে, জগৎ-কার্য্যে যখন জ্ঞান-পদার্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগৎকারণেও জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। কিয়ৎপরে তিনি আপনিই প্রতিপক্ষের হইয়া এই এক তর্ক তুলিয়াছেন যে,

"চূর্ণ ও হরিদ্রা এই উভয়ের কেহই লোহিত বর্ণবিশিষ্ট নহে, অথচ উভয়ের সংযোগে রক্তবর্ণের আবির্ভাব হয়। অথবা দশখানি দ্রব্য মিলাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইল, তাহাদের কোন একটির পিত্তঘ্নতা নাই, কিন্তু দশখানি মিলিত হইলে পিত্তঘ্নতা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন দেখিতেছ যে, কার্য্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহা কারণীভূত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না ; সেইরূপ কেন বল না যে, চৈতন্য এই দেহের নিদান-ভূত ধাতু সকলের মধ্যে কোন একটিতে ব্যষ্টিভাবে না থাকিলেও সমষ্টিভাবে তাহাদের সংযোগ-সিদ্ধ দেহপিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে।"

শাস্ত্রী মহাশয় এই তর্কের খণ্ডন-ছলে বলিয়াছেন যে,

ইহা উপমা মাত্র হইল, প্রমাণ হইল না।

তাঁহার এ কথা আমাদের মনে ধারণা হইতেছে না ;—শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কোন কার্য্যেই এমন কোন গুণ থাকিতে পারে না, যাহা তাহার কারণে নাই ; তাঁহার প্রতিপক্ষ বলিতেছে যে, এমন অনেক কার্য্য আছে যাহার গুণ তাহার কারণে নাই ; শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন আচ্ছা—এমন একটা-কোন কার্য্যের একটা-কোন গুণ আমাকে দেখাও যাহা তাহার কারণে নাই। তাঁহার প্রতিপক্ষ অমনি চূর্ণে হলুদে মিসাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধারন-পূর্ব্বক বলিতেছে—"দেখিতে চাও—এই দেখ! ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ—প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি আছে? শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রমেয় বিষয়টি আর একরূপে প্রমাণ করিলেই ভাল হইত,—তিনি বলিতে পারিতেন,—

কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। মনে কর চূণ এবং হরিদ্রা এই দুই বস্তু মিলিয়া-মিশিয়া একটি লোহিত বর্ণ দ্রব্যে পারণত হইল; মিশ্র বস্তুটির সেই-যে লোহিত বর্ণ তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটি মূল-বস্তুর দুইটি বর্ণ হইতে ভিন্ন—তাহা তৃতীয় একটি বর্ণ; কিন্তু ঐ দুই মূল বস্তুর যে দুই সত্তা, তাহার অতিরিক্ত কোন সত্তাই মিশ্র বস্তুটিতে থাকিতে পারে না,—তৃতীয় বর্ণের ন্যায় তৃতীয় সত্তা থাকিতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের গুণ যদিও এমন হইতে পারে যাহা কারণে নাই, কিন্তু তা' বলিয়া কার্য্যের সত্তা এমন হইতে পারে না—যাহা কারণে নাই। এই যুক্তিতে পাওয়া যায় যে, মূল কারণে যদি চেতন-পদার্থের সত্তা না থাকিত, তবে জগতে তাহা কোন প্রকারেই আসিতে পারিত না। এখানে এইটি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক যে, চেতন-পদার্থের সত্তা এবং জড়পদার্থের সত্তা দুয়ের মধ্যে একটি মূল-গত প্রভেদ আছে ; সে প্রভেদ এই যে, চেতন পদার্থের সত্তা তাহার আপনার জন্য—চেতন-পদার্থ আপনি আপনার সত্তা অনুভব করে,—জড়-পদার্থের সত্তা পরের জন্য—চেতন-পদার্থই জড়-পদার্থের সত্তা অনুভব করে ; এক কথায়—চেতন-সত্তা আত্মার্থিকী,

জড়-সত্তা পরার্থিকী ; চেতন-সত্তা এবং জড়-সত্তার মধ্যে এইরূপ এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর উত্থাপিত রহিয়াছে। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের সহজেই মীমাংসা হইতে পারে, যথা,—কার্য্যেতে যখন এমন কোন সত্তা-ই থাকিতে পারে না যাহা কারণেতে নাই, তখন ইহা মানিতেই হইবে যে, মূল কারণে চেতন-সত্তা বিদ্যমান থাকাতেই জগতে চেতন-সত্তা আবির্ভূত হইতে পারিতেছে। আর এক কথা এই যে, মনে কর যে জগতের কোথাও কোন-একটিও জীব নাই, তাহা হইলে জড়ের যত কিছু গুণ আছে সমস্তই গতি ও সংহতি (Solidity) এই দুই গুণে পর্য্যবসিত হয়, জড়-বস্তুর ঐ দুইটি গুণ ভিন্ন তাহাতে আর যে কোন গুণ লক্ষিত হয়, সমস্তই জীবের অস্তিত্ব সাপেক্ষ ;—কামানের বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে সেই বারুদের পরমাণুগণের মধ্যে যে-এক-প্রকার গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই কেবল জীবের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে না—তাহাই বিশুদ্ধ-রূপে জড়-গুণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শব্দাদি আর যে কোন গুণ আবির্ভূত হয় সমস্তই জীবের অস্তিত্ব-সাপেক্ষ ;—জগতের কোথাও যদি কোন জীব বর্ত্তমান না থাকে, তবে "শব্দ" বলিয়া একটা আবির্ভাব জগতের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাতে এইটি প্রমাণ হইতেছে যে, চূণেহলুদে মিশ্রিত হইলে তদুৎপন্ন বস্তুটিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা মুখ্য-রূপে কেবল গতির পরিবর্ত্তন; চূণের আণব (Molecular) গতির সহিত হলুদের আণব গতি মিলিত হইয়া তৃতীয় একপ্রকার আণবগতি উৎপাদন করে,—অর্থাৎ বায়ুর বেগ এবং স্রোতের বেগ মিলিত হইয়া নৌকাতে যেমন তৃতীয় এক-প্রকার বেগ উৎপাদন করে,—সেইরূপ। জীব-একটি সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলেই উক্ত মিশ্র-বস্তুটির ঐ আণব গতি জীবের প্রাণে কার্য্য করিয়া তাহার চক্ষে রক্তবর্ণরূপী একটি অবভাস উৎপন্ন করে। সুতরাং ঐ যে অবভাস, উহা জীবাশ্রিত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, জড়-বস্তু হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতে এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে, জড় বস্তু হইতে জীবও উৎপন্ন হয় ; কেননা জীব আগে আছে—তাই তাহাকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি পরে উৎপন্ন হয়, এরূপ নহে যে, আগে শব্দাদি উৎপন্ন হয়—তাহার পরে জীব উৎপন্ন হয়। এক দিকে জীব আর-এক দিকে জড়—শব্দাদি গুণ-সমূহ দুয়ের মধ্যস্থলে ; শব্দাদি গুণ-সমূহ জড়বস্তুর যত নিকট-বর্ত্তী, জীব তাহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী; —জড়-বস্তু যখন জীবের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই নিকট-বর্ত্তী গুণ-গুলিই স্বতঃ উৎপাদন করিতে পারে না, তখন দূরবর্ত্তী জীব উৎপাদন করা তাহার পক্ষে কত যে দূরে হাত বাড়ানো—কত যে অনধিকার চর্চ্চা—কত যে অসাধ্য ব্যাপার—তাহা পাঠক-বর্গ বুঝিতেই পারেন। অতএব, শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলিলে, তাঁহার মন্তব্য কথা তিনি অকাট্য রূপে সংস্থাপন করিতে পারিতেন।

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় আর-একটি অপক্ব সিদ্ধান্ত যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—সে সিদ্ধান্তের মূলে যে, একটি দারুণ দোষ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা তিনি দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন

"যে ব্যক্তি কখনো দেখে নাই যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন-শীল ঘটনা-রাজি দেখিয়া শক্তির অনুমান করিতে পারে ?"

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি কেহই দেখে নাই—দেখিতে পারেও না ; আমরা যাহা দেখি

তাহা এইমাত্র যে, দিন যেমন রাত্রির নিয়ত পরবর্ত্তী, হস্ত-চালনা সেইরূপ বল-প্রয়োগের নিয়ত-পরবর্ত্তী;—বল-প্রয়োগের চেষ্টা-টি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ে অনুভব করি, হস্ত-চালনা-টি আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবলোকন করি, কিন্তু কার্য্য-কারণের বন্ধন-সূত্রটি আমরা বহিরিন্দ্রিয়েও উপলব্ধি করি না, অন্তরিন্দ্রিয়েও উপলব্ধি করি না,—অথচ আত্মপ্রত্যয়ে ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করি। মনে কর একটা কবাটকে এই দেখিলাম স্থির রহিয়াছে, ক্ষণ পরে দেখি তাহা বিচলিত হইয়াছে;—তাহার অবশ্যই কোন-না কোন কারণ আছে—এইটি প্রথম প্রস্তাব; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিকট-বর্ত্তী কোন-একটি ঘটনাই তাহার কারণ—এইটি দ্বিতীয় প্রস্তাব; কবাটখানির গতির অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং কবাটের অব্যবহিত নিকটে বায়ু সহসা বেগে বহিয়াছিল—অতএব তাহাই তাহার কারণ—এইটি চরম সিদ্ধান্ত। হস্ত চালনা-ব্যাপার টিরও কারণ-নির্দ্ধারণ ঐরূপ পদ্ধতিতে হইয়া থাকে,—উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, বায়ু-বেগ স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর—প্রযত্নবেগ অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর, কিন্তু উভয়ত্রই কার্য্য কারণের সম্বন্ধটি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহে—তাহা শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রত্যয়েরই গোচর। আমার হস্ত বিচলিত হইল—ইহার অবশ্যই কোন-না-কোন কারণ আছে—এইটি প্রথম প্রস্তাব; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী কোন একটি ঘটনাই তাহার কারণ, এইটি দ্বিতীয় প্রস্তাব; হস্ত-চালনার চেষ্টাই তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী ঘটনা, অতএব তাহাই তাহার কারণ, এইটি চরম সিদ্ধান্ত। আপনার হস্ত-চালনাই দেখি, আর একটা কবাটের সহসা বিচলিত হওয়াই দেখি—তাহা দেখিবামাত্রই, কোন পরীক্ষার অপেক্ষা না রাখিয়া—তৎক্ষণাৎ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলি যে, ঐ ঘটনাটি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন ঘটনার সহিত কার্য্যকারণ সূত্রে সম্বদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী দুইটি ঘটনা আমরা উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি—কিন্তু সহস্র পরীক্ষা করিলেও কার্য্য-কারণের বন্ধন-সূত্র উভয়ের কোন স্থানেই খুঁজিয়া পাইব না; তাই আমরা বলি যে, তাহা বহিরিন্দ্রিয়-মূলক এবং অন্তরিন্দ্রিয়মূলক উভয়-বিধ পরীক্ষারই অগম্য—শুদ্ধ কেবল আত্ম-প্রত্যয়েরই গম্য। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটির সার্ব্বভৌমিকতা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কালের মুহূর্ত্ত-পরম্পরার প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারিবে। কালের কোন একটি মুহূর্ত্তই যেমন পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত হইতে যোগচ্যুত অথবা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত হইতে পারে না, সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন-ঘটনাই এমন হইতে পারে না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন-না-কোন ঘটনার সহিত কার্য্য-কারণ-সূত্রে সম্বদ্ধ নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—কালের শ্রেণীবদ্ধ মুহূর্ত্ত-পরম্পরায় আমরা কেবল প্রবৃত্ত কারণেরই ছবি দেখিতে পাই, স্বাধীন কারণের বা মূল প্রবর্ত্তক কারণের—ছবি দেখিতে পাই না। শাস্ত্রী মহাশয়ের উচিত ছিল এইরূপ বলা যে, আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন কোন ভৌতিক শক্তিতেই মূলপ্রবর্তকের ভাব বিদ্যমান থাকিতে পারে না;—ভৌতিক কারণ মাত্রই কালের অন্তঃপাতী প্রবৃত্ত কারণ; যথা—তরঙ্গের কারণ কি? না বায়ু-বেগ; তাহার কারণ কি? না পৃথিবীর গতি ও তাপ-বৈষম্য; তাহার কারণ কি? না আকর্ষণ বিকর্ষণ ও জলস্থলাদির বৈষম্য; তাহার কারণ কি?

ইহার উত্তর দিতে হইলে জ্যোতিষ বিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, আরও কত না বিদ্যা আয়ত্ত করা আবশ্যক,—অথচ তাহার যে, একটা-না-একটা কারণ আছেই আছে এবিষয়ে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না,—এই রূপ কার্য্য-কারণের সূত্র ধরিয়া আরোহ-পদ্ধতি অনুসারে যে কোন ভৌতিক কারণে উত্তীর্ণ হও না কেন—দেখিবে যে, তাহা প্রবৃত্ত কারণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড় বস্তুর সত্তা পরার্থিকী অর্থাৎ উহার সত্তা শুধু কেবল পরেরই জন্য,—চেতন বস্তুই উহার সত্তা অনুভব করিতে পারে; এখন বলিতে চাই যে, জড়বস্তু পরের দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইয়া স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে না; নিরুদ্যমতাই Inertia জড়বস্তুর মর্ম্ম-নিহিত ধর্ম্ম-তাহাই জাড্য;—অদ্বিতীয় মূল কারণ দ্বিতীয় কোন কারণের বশবর্ত্তী নহেন সুতরাং তিনি স্বয়ং-প্রবর্ত্তক স্বাধীন কারণ; তবেই হইল যে, তিনি নিরুদ্যম প্রবৃত্ত কারণ নহেন—প্রকৃতি নহেন—তিনি পরমাত্মা। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মূল-প্রবর্ত্তকের ভাব আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না—কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে গিয়া বলিয়াছেন এই যে, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-তত্ত্বটি আমরা আপন বল-চেষ্টার পরীক্ষা হইতেই উপার্জ্জন করিয়াছি। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ তত্ত্বকে আগন্তুক পরীক্ষা-সিদ্ধ তত্ত্বের পদবীতে দাঁড় করাইয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই, তাহাতে তিনি আপনারই মূল শিথিল করিয়াছেন। তাহা না করিয়া তিনি যদি এইটি প্রমাণ করিতেন যে, মূল-প্রবর্ত্তকতা আত্মার্থিকী চেতন-সত্তারই ধর্ম্ম, ও তাহা পরার্থিকী জড় সত্তার বিরোধী ধর্ম্ম, তাহা হইলেই তাঁহার কথার উপর আর কাহারো কোন কথা চলিতে পারিত না। প্রবন্ধটির দুই স্থানের দুই দোষ যাহা আমাদের চক্ষে ঠেকিয়াছে তাহা দেখাইলাম;—অবশিষ্ট সমস্ত অংশ নির্দোষ বলিলে অতি অল্পই বলা হয়—এক জন শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মের লেখনী হইতে যেমন-টি প্রত্যাশা করা যায় তাহা তাহার কোন অংশেই ন্যূন নহে। যে অংশ-গুলি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের সমুদায় সত্য যাঁহারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে যাঁহারা মানবের অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মহাশক্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকাতে হার্বর্ট স্পেনসার এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds."

"অর্থ—জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শক্তি আছে, যাহা হইতে চরাচর বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রণীত Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেনঃ—

"It would seem then that, in the only sense in which experience supports in any shape the doctrine of a First Cause—viz, as the primœval and universal element in all causes the First Cause can be no other than Force"—Mill's Essay on Theism.

অর্থ।—"কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, এবং কারণ শব্দের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমুদায় কারণের আদি ও সর্ব্বব্যাপী কারণ রূপে যাহা বিদ্যমান, সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা যায় না।"

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্ব্বচনীয় মহা-

শক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাও নহে, এই আদ্যাশক্তি, এক,অনন্ত ও অবিনাশী। প্রথম প্রশ্ন এই—এই শক্তি যে এক, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই ব্রহ্মাণ্ড দুই বা তদ্বিধ শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার উত্তর জন ষ্টুয়াট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন।

"The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished."

অর্থ—"এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে; যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।"

এই শক্তি এক ও অক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বব্যাপী। তবে এই মহা পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আমরা এইটুকু সত্যে উপনীত হইতেছি যে, বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান, যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অবিনাশী ও অনন্ত।

কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জড়-শক্তি বলিয়া অনুভব করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগ্‌নেটিজীম, শক্তি বটে, কিন্তু অন্ধ জড়শক্তি মাত্র-সেইরূপ এই আদি শক্তিও অন্ধ জড় শক্তি মাত্র। স্পেন্‌সার বলেন, এই শক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়, অথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব চৈতন্যেও এই শক্তির প্রকাশ "It wells up in consciousness"—"এই শক্তি মানবের চিৎশক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে" আর ও একস্থানে বলিয়াছেন—"Some thing more than consciousness" অর্থাৎ চিৎশক্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক।

এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্তির বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারা যায় কি না? স্পেনসারের যে উক্তিটী সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই মহাশক্তি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে যেমন তৈল নিঃসৃত হয়, জল হইতে যেরূপ বাষ্প নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তিত স্বরূপ মাত্র। এখন প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মানবাত্মা কি আশ্চর্য্য বস্তু! কি গভীর প্রহেলিকা! এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্য কোথা হইতে সৃষ্টির রাজ্যে দেখা দিল? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই জগতের অবস্থা এক কালে উষ্ণ বাষ্পাকার ছিল এবং তখন সেই উষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্যে মানব চৈতন্য দূরে থাকুক, কোন প্রকার জীবাঙ্কুরেরও থাকা সম্ভব ছিল না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের এক স্থলে মিল বলিয়াছেনঃ—

"There is a vast amount of evidence that the state of our planet was once such as to be incompatible with animal life, and that human life is of very much more modern than animal life"—Essay on Theism.

অর্থ।—"ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের জীবন রক্ষার উপযোগী ছিল না, এবং মানব জীবন অপর জীবনের অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে।"

Encyclopedea Britanica নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত Huxley হাক্‌সলি সাহেব (Biology) অর্থাৎ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার একস্থানে বলিয়াছেন;—

"The condition of the globe was at one time such, that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state."

অর্থ।—"পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তখন কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; কারণ বাষ্পাবস্থায় ইহা কোন প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।

তবেই দেখা হইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ বাষ্পময় ও জীবন ধারণের অনুপযোগী ছিল, তখন ইহাতে বিচিত্র শক্তিময় মানবাত্মা দূরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল না। ধরাধামে জীবন ছিল না, জীবন আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর—জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র; দ্বিতীয় উত্তর—ইহা কোন চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত। দেখা যাউক, প্রথম উত্তরটী কতদূর যুক্তিযুক্ত, ইহা সপ্রমাণ হয় কি না? যদি বলা হয়, জড় হইতেই জীবনের উৎপত্তি, তাহা হইলে এই বলা হইল, অচেতন শক্তি

চেতনকে প্রসব করিয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন;

"The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things; and the present state of knowledge furnishes us with no link between the living and the not-living."

অর্থ।—"সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে, কিরূপে যে জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন;—

"Of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing."

অর্থ।—"কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, আমরা কিছুই জানি না।"

উপনিষদ কহিয়াছেন;—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"। 'ইহাঁর শক্তি মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বাভাবিক'

শিশুর স্তন-পানরূপ ক্রিয়াটীর বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখা যাউক। এ ক্রিয়াটী কেমন আশ্চর্য্য!!! এতদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে অথচ সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই, আবার কিরূপে যে ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ সুচারুরূপে সেই ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াটী অন্যান্য ক্রিয়া হইতে কিরূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটী ক্রিয়া করিতেছে, যদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, সেই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও সেই মঙ্গল অভিসন্ধি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে? মানব শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান ক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পশু পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহারা জানে না, এবং কোন বুদ্ধিমান জীব করিলে তাহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, অথচ তন্মূলে তাহাদের বিচার শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণ, মধুমক্ষিকার মধু সঞ্চয়, বোল্তা প্রভৃতির খাদ্যাহরণ কার্য্য এই শ্রেণীগণ্য। ভেকদিগের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়ার অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় মস্তক বিহীন শরীরার্দ্ধ— যখন পড়িয়া আছে, তখন তাহার এক খানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখন আর এক খানি পা দিয়া সেই এসিড্ বিন্দু মুছিবার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে। এই ক্রিয়ার প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য!! এ কার্য্যে যে তাহার কর্তৃত্ব নাই, তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখানেও দেখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে এমন একটী কার্য্য হইতেছে, যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ কি বলিবেন? যে জ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কোথায়? শুনুন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ মিভার্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? বিগত এপ্রিল মাসের Fortnightly Review পত্রিকাতে তিনি লিখিয়াছেন:—"for myself I am bound humbly to confess that the more I study nature, the more I am convinced that in the action of this all-pervading but inscrutable and unimaginable intelligence, of which self conscious human rationality is the utterly inadequate image attainable by us, is to be sought the possible explanation of the mysterious but undeniable presence in Nature of a rationality in that which is in itself irrational.'

অর্থ—"আমার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নিকট আমি বিনয় সহকারে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি যতই প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, সেই সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় পরম জ্ঞানকে— আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মানবীয় জ্ঞান যাহার ছায়ামাত্র,— অথচ (এই নানা জ্ঞান ভিন্ন সে জ্ঞানের অন্য প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই) স্বীকার করা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে বিচার বিহীন ও জ্ঞান বিবর্জ্জিত প্রাণিতে জ্ঞান ক্রিয়া দর্শন রূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্যার সদুত্তর হইবার উপায়ান্তর নাই।"

সেই আদ্যা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী, তার একটী যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়—তাহা সৃষ্টিকৌশল

দর্শনে স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয়। এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও এই পত্রিকারই প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি সে সকল দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিব না। তবে এ বিষয়ে দুই একটী বড় লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব। সুবিখ্যাত ডারুইন সাহেবের Fertilization of Orchids নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন। সে ঘটনাটী এই;—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্য পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে পুষ্পের গঠনের মধ্যে এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না, মধুর নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভরেণুর সহিত মিলিয়া যায়। মধুপানে যে বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া ডারুইন বলিয়াছেন;—"If this is accidental, it is a fortunate accident for the plant. If this be not accidental, and I cannot believe it to be accidental, what a Singular case of adaptation !"

অর্থ।—"এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন আকস্মিক যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে!"

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের এক স্থলে বলিয়াছেন;—

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

অর্থ।—"আমার বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানদ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। (১ম) ইচ্ছা প্রসূত ক্রিয়া, (২য়) স্বভাবজাত ক্রিয়া, (৩য়) অভ্যাস জাতক্রিয়া, (৪র্থ) ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া।

(১ম) বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়া—যেমন একটী প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহা উত্তেজক, জ্ঞান পথপ্রদর্শক, ও প্রবৃত্তি কার্য্যের পরিচালক।

(২য়) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা মানব কখনও শিক্ষা করে নাই, কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য স্বভাবতই তাহা করে—তাহা স্বভাবজাত ক্রিয়া; যথা, শিশুর স্তন পান। স্তন পানরূপ ক্রিয়াটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে টানিলে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়া, বিনা শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে জননীর চুচুক মুখে লইয়া টানিয়া থাকে। ইহা পুষ্প চয়নার্থ হস্ত প্রসারণের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া নয়, অথচ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়াও নয় ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই।

(৩য়) আর এক প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে ইচ্ছা ও জ্ঞানের যোগ ছিল, কিন্তু অভ্যাস বশত সে যোগ আর এখন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। তাহা অভ্যাসজাত ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। আমরা গমনার্থ পদবিক্ষেপ করি, কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের জ্ঞান থাকে যে, পদবিক্ষেপ করিতেছি, এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান দেখা যায়? তাহা যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্রে রহিয়াছে, আমাদের মন কোন নিগূঢ় প্রশ্নের সমস্যাতে বিব্রত রহিয়াছে, অথচ আমরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে ও পড়িতেছে, গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যেন কলে কার্য্য চলিতেছে। এক সময়ে মনের কর্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির ফন্দী করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের ক্রিয়ার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটী শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার চিন্তা কর; তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া হাঁটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাস বশত সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। এরূপ শুনাও গিয়াছে যে, কোন কোন লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইয়া থাকে।

(৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের ঘোর সুষু-

প্তির অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তস্রোতের গতিবিধি ইত্যাদি। ঐ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ক্রিয়াতেই আমরা কর্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছার বিদ্যমানতা দেখিতেছি। শিশু সন্তানের স্তনপান স্থলে, যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞতাসহকৃত ও স্বভাবপ্রণোদিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা সুতরাং তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিও আংশিকরূপে বিদ্যমান। সে মুখবিকাশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় ধরিতেছে, দুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে এ সকল তাহার কার্য্য, সুতরাং এ সকলের অন্তরে তাহার ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই রূপ অভ্যাসজনিত কার্য্য যে স্থলে হইতেছে, সেখানেও অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া সেই পথিক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও ঠিক পথে যাইতেছে, পথের বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতেছে, গো, মহিষ, শকট প্রভৃতির পথ পরিহার করিতেছে, যেখানে যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে তাহা ফিরিতেছে? এতদ্দ্বারাই বোধ হয় যে, সে একটী চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও অতি সূক্ষ্মরূপে তাহার দর্শন, শ্রবণ, বিচার প্রভৃতিও চলিয়াছে এবং তাহার ক্রিয়েচ্ছাও কার্য্য করিতেছে। এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও গমনের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যেও অতি প্রচ্ছন্নভাবে পথের জ্ঞান রহিয়াছে, নতুবা সে ব্যক্তি বিপথে যাইতেছে না কেন? নিদ্রিতাবস্থাতে যে আমাদের এক প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় যে, রাত্রিকালে উঠিয়া যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি সেই সংস্কার ও উৎকণ্ঠা লইয়া শয়ন করে, দেখিতে পাই, এক ঘুমের পর আপনা আপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? নিদ্রার মধ্যেও তাহার মনে যদি বিচার ও বোধ শক্তি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিক সময়ে জাগিল? এক বার এক খানি জাহাজ সমুদ্রে যাইতেছিল। যখন রাত্রি ১১ টা তখন তাহার কাপ্তেন নিদ্রা গেলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময় দিঙ্‌নির্ণয় দ্বারা বুঝিলেন যে রাত্রি দুইটার পর জাহাজ খানি সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইবে, সে সময়ে জাহাজের মুখ একটু ফিরাইয়া না দিলে একটা বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়া তিনি প্রহরীদিগকে দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘড়িতে ঠিক যখন দুইটা, প্রহরীগণ ডাকিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেখেন যে ঠিক দুইটা বাজিয়াছে কিন্তু জাহাজ আশাতীত বেগের সহিত আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত থাকিলে সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিপদ হইতে জাহাজ খানি বাঁচিয়া গেল। এখানেও দেখা গেল যে, গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াস্থলে আমরা ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি, কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছা-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি, তন্মধ্যেই মানবের ক্রিয়েচ্ছা দেখা যাইতেছে না। অথচ তদুপরি মানবের কর্তৃত্ব শক্তি না থাকার অতি গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। যে সকল ক্রিয়া জীবনরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে, যাহার অকরণে হঠাৎ জীবননাশের সম্ভাবনা নাই সে সকল কার্য্য মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধীন রহিয়াছে, কিন্তু এই কতক গুলি ক্রিয়া মানব দেহেই হইতেছে, এবং যাহা মানবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ও যাহার অভাবে নিমেষ মধ্যে মানবের জীবননাশের সম্ভাবনা, সে গুলির উপরে মানবের কর্তৃত্ব নাই, তবে তদুপরি কাহার কর্তৃত্ব? ইহা কি মানবদেহের একটী আশ্চর্য্য তত্ত্ব নহে। এই বন্দোবস্তের প্রতি চিন্তাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিলে বিশ্বকারণে জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও ক্রিয়েচ্ছা তিনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রসূতির প্রসব বেদনা। একজন দেহ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন যে, গর্ভিণীর যখন প্রসব কাল উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার বেদনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ভিণী গর্ভস্থ ভ্রূণদেহের নিষ্ক্রামণোপযোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন। তাহাকে কোঁতপাড়া বলে। সহজ শরীরে মলত্যাগাদির সময়ে কাহাকেও যদি সেইরূপ কোঁত পাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও কত বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তি যদি কোথাও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত শ্রমজনক ক্রিয়ার মধ্যে। অথচ প্রসূতি যখন ঐরূপ কোঁত পাড়েন, তখন তদুপরি তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কর্তৃত্ব শক্তি ও ক্রিয়েচ্ছার

বহির্ভূত। যদি তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে ক্লোরোফারম করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে হতচেতন করিয়া ফেলা যায়, তথাপি যথাকালে ঐ বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ ও বল প্রয়োগের কার্য্য হইতেছে, অথচ যে ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতেছে তাঁহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠক মহাশয় কি বিবেচনা করেন? সে কার্য্য কাহার ইচ্ছামত হইতেছে? সেই বেদনার সময় প্রসূতির উপরে উক্ত অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য করিবার ভার রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারিত, এই জন্য বিশ্বকারণ আপনার হাতে সেই ভার রাখিয়াছেন, ইহা কি পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় না। ইহাও বিশ্বকারণে ক্রিয়েচ্ছা ও মঙ্গল ভাব বিদ্যমান থাকার অপর একটী প্রমাণ।

অতএব বিশ্বকারণে জ্ঞান আছে; এবং ক্রিয়েচ্ছা (will) আছে। কেবল তাহা নহে, প্রীতিও আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আসুন একবার চিন্তা করিয়া দেখি, প্রীতির সর্ব্বপ্রধান চিহ্ন কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী হয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই আমাকে প্রীতি করে। ইহা সত্য কি না? যদি দেখি আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া জগতের এত অসংখ্য মানবের মধ্যে দশটী লোক আনন্দ করিতেছে, এবং সেই দশজন যাহাতে আমার আরও লাভ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই দশজন আমার মিত্র অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন। ইহা অতি সহজ কথা, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক মহাশয় একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হস্তে লইয়া বিচার আরম্ভ করুন। যদি নিকটে গোলাপের বাগান থাকে, তবে বিশেষ অনুরোধ করি যে, ত্বরায় একটী গোলাপ তুলিয়া আবার এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে করিয়া লই, তাঁহার হস্তে একটী গোলাপ রহিয়াছে। ঐ গোলাপটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহার পাপড়ীগুলি কেমন কোমল? উহার গন্ধ কেমন চিত্তের আনন্দ দায়ক? উহার বর্ণ কেমন মনোমোহনকারী। এখন চিন্তা করুন, ঐ সুন্দর বর্ণ কেন ঐ পুষ্পে ঢালা হইয়াছে? তাহার সুগন্ধ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, তাহা না থাকিলে ভ্রমর ইহার দিকে আকৃষ্ট হইত না* এবং ভৃঙ্গ না আসিলে পরাগ-রেণু পড়িত না, ফল জন্মিত না। সুতরাং গন্ধের উল্লেখ করিলাম না। উহার বিচিত্র বর্ণ কেন দেওয়া হইল? সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবের নাম কি পাঠক মহাশয় করিতে পারেন, গোলাপের ঐ সুন্দর বর্ণ না থাকিলে, যাহার জীবন ধারণের ব্যাঘাত হইত? আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, পশু পক্ষীদিগের কাহারও প্রাণধারণ ঐ সুন্দর বর্ণের উপর নির্ভর করিতেছে না। উহার বর্ণ ওরূপ অত্যুজ্জ্বল ও সুন্দর না হইলে মধুলোভী ভৃঙ্গের আসিবার কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে উহাতে ওরূপ বিচিত্র বর্ণ ঢালা হইল কেন? উহার ও বিচিত্র বর্ণ না থাকিলে আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত কি না? কে বলিবেন যে, আমাদের প্রাণ ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত? ইহার অভাবেও আমরা বাঁচিতাম, কিন্তু ইহা থাকাতে একটু সুখে বাঁচিতেছি; ইহা না থাকিলে একটু সুখের ব্যাঘাত হইত। তবে ত সৃষ্টির মূলে এরূপ দেখিতেছি যে, বিশ্বকারণ এরূপ চাহিয়াছেন যে, আমরা যে কেবল কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকি তাহা নহে, কিন্তু বাঁচিয়া সুখে থাকি। এবং সেই জন্য আয়োজনও করিয়াছেন। প্রীতির পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অনুসারে উহা কি প্রীতি নহে? কেগো তুমি বিশ্বের অন্তরালবাসি শক্তি! "তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি," ঐ গোলাপটী দেখিয়া পাঠক মহাশয়ের প্রাণ কি এরূপ বলিয়া উঠিতেছে না?

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধিক বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। যে প্রীতি দেখিয়া বিশ্বকারণে প্রীতির অনুমান করিতেছি, সেই মানবপ্রীতির বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। মনে করুন, আমাদের প্রীতি যদি না থাকিত, কেবল স্বার্থ ও সুখাসক্তিই যদি আমাদের পরিচালক হইত, সংসারের অধিকাংশ কাজ অব্যাঘাতে চলিত কি না? বণিক স্বার্থের জন্য পণ্যদ্রব্য আনিত, আমি পেটের দায়ে কিনিতাম, পাচক বা পাচিকা স্বার্থের জন্য শ্রম করিত, আমার অন্ন পান ঘুচিয়া যাইত, এইরূপ চলিয়া যাইতেছে। পুরুষ সুখাশক্তির জন্য স্ত্রীলোককে চাহিত; স্ত্রীলোক সেই কারণে পুরুষের সঙ্গিনী হইত। ইহাতে কি প্রাণ রক্ষা ও সৃষ্টি রক্ষা হইত না? কিন্তু এই স্বার্থ ও সুখাসক্তির মধ্যে প্রেম নামে একটা পদার্থ কে ঢালিয়া দিল, দিয়া সমুদায়কে মধুময় করিল! আহা! প্রেম কি পদার্থ! কোন কবি কোথায় আছেন, যিনি এই স্বর্গীয় পদার্থের মহিমা অদ্যাপি বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? পাচিকা ব্রাহ্মণী যে পয়সার লোভে খাটিতে আসিয়াছে, আমার

* আমরা যেন কোথায় পড়িয়াছি মনে হয় যে, গন্ধহীন পুষ্প হইতেই মধুমক্ষিকা মধু আহরণ করে—যাহাই হউক ইহাতে করিয়া লেখকের তাৎপর্য্যে কোন ব্যাঘাত আসিতে পারে না। সং

প্রতি উহার স্নেহ ও ভালবাসা পড়ুক অমনি উহার ঐ হস্তের শ্রম মিষ্ট হইয়া যাইবে, শ্রম করিয়া প্রাণ পরমাপ্যায়িত হইবে আমি সুখে আহার করিলে ও ব্যক্তি স্বর্গ হাতে পাইবে, আমি সেই অন্নের সঙ্গে অমৃত আস্বাদন করিব। ধন্য প্রেম, তোমাকে ছোয়াইলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অনেক স্থলেই আমরা প্রেমের অভাবে বাঁচিতে পারিতাম বটে; কিন্তু এমন সুখে বাঁচিতে পারিতাম না। কে গো বিশ্বের অন্তরালবাসিনী শক্তি, তুমি কেন চাও যে আমরা সুখে থাকি? এই প্রশ্ন আবার মনে উদয় হইতেছে। আর ইহাও কি সম্ভব যে, মানব হৃদয়ে এই প্রেমাগ্নি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্বকারণ হইতে মানব হৃদয় সমুৎপন্ন, তাহাতে সেই প্রেমাগ্নি নাই? অতএব বলি বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা নহে, প্রেমও আছে।

কেবল তাহা নহে, তাঁহাতে আরও কিছু আছে। মানব প্রকৃতির আর একটী গূঢ় তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিন্ধুকের চাবিটী হারাইয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে অনেক গুলি চাবি আনাইয়াছেন; এক একটী করিয়া চাবী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিগুলি গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক করিয়া বার বার দেখিয়া শেষে বলিতেছেন, না এটা লাগিল না, এই বলিয়া সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি শুনিয়াছিলেন যে, কোন একটী বিশেষ দ্রব্যে বমন নিবারণ করে। তিনি এক শত স্থলে সেইটী প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, বমন নিবারণ করে না। তৎপরে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার শুনা কথা মিথ্যা। তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। আর পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। মানবের সকল কার্য্যেই এরূপ দেখা যায়; দশবার দেখিয়া যাহাতে বিফল হওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। সকলেই বলিবেন, ইহাই মানব-মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। এই সংগ্রামের প্রকৃতি আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) এই সংগ্রামে দুর্ব্বলতা বশত বার বার অকৃতকার্য্য হইয়াও সাধুতা শ্রেষ্ঠ নয় বা সাধুতার জয় হইবে না, এরূপ বিশ্বাসে কেহ উপনীত হয় না—সে শতবার পড়িয়াও আশা করে। অন্যান্য স্থলে দশবার হারিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থলে শতবার হারিয়াও নিরাশ হইতেছে না। (২য়) সে যখন দুষ্প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইতেছে, তখনও পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করে যে, ধর্ম্মেরই জয়যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতেও পুণ্যের মহত্ত্ব অনুভব করে। এই ধর্ম্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সে যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করে না যে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়াছে, তাহার লাভ করিবার আর কিছু নাই, বরং যে যত ঊর্দ্ধে উত্থান করে, সে তত মস্তকের উপরে ধর্ম্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম দুইটী হইতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বে বিশ্বাস মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা অপরাপর বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, অকৃতকার্য্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়টী দ্বারা এই সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে ভাব আছে, তাহার কোন একটী সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্ত্বজ্ঞান স্বাভাবিক এবং ধর্ম্ম-ভাবের মধ্যে অনন্তের ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য এক সঙ্গে আলোচনা করিলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়, ইহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম নিয়ম, সেই ধর্ম্ম নিয়ম সেই বিশ্বের আদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন।

মানব হৃদয়ের এই ধর্ম্মভাবের গভীরতা যে কত, তাহা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। একি এক আশ্চর্য্য ভাব মানবকে শাসন করিতেছে!! রোমদেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন দুইজন কনসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিদ্বেষ যে তাঁহারা এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি পুনরায় রাজাদিগকে মানিবার ষড়যন্ত্র মধ্যে থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পর কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারার্থ উক্ত কনসল দ্বারা নিকটে নীত হইল। দুর্ভাগ্য বশত সেই যুবকদলেব মধ্যে একজন কনসলের দুইটী পুত্র ছিল। তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়া আইনসঙ্গত দণ্ড দেওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানে তিনি যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রদিগের দোষ সপ্রমাণ দেখিলেন, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে বধভূমিতে লইয়া

চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। এক দিকে অপত্য স্নেহ অপর দিকে কর্ত্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্ত্তব্য জ্ঞানই জয়যুক্ত হইল, এমন ব্যাপারটী মানব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? বিগত মিউটিনীর সময় সার হেনরি লরেন্স অযোধ্যার কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্ণৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌএর দিকে আসিতেছে। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই বিপদের সময় তাঁহার নিজের গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশীয়দিগের প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরাজিত হইলে, লক্ষ্ণৌ নগরের প্রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, সহরের ও চতুঃপার্শ্বের সমুদায় ইংরাজকে সেই বাড়ীতে পুরিয়া বাড়ীটীকে দুর্গপ্রায় করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাঁহার গৃহ মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিল। সেই প্রহার বেদনায় তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, ইহার পর কয়েক দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই অসহ্য যাতনার মধ্যে তিনি সতত সেই বাড়ীতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের উপদেশ দিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার পরামর্শ দিতেছেন, শিশুদিগের তত্ত্ব লইতেছেন। পাঠক মহাশয় কোন পশুতে এপ্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনাও করিতে পারেন কি না? শরীর মন সমুদায় অবসন্ন, সমুদায় বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে—এই স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল মানবে সম্ভব। একদিকে যেমন কর্ত্তব্য জ্ঞান অপর দিকে অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রু মুক্তাদল হইতেও সুন্দর। এ অশ্রু ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহা করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই, ইহা বলিয়া কোন নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে ম্লান হইতে দেখিয়াছেন? এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি এই উচ্চতা ও গভীরতাকে মানব প্রকৃতিতে নিহিত করিয়াছেন, তিনি যে "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" "ধর্ম্মের আবহ ও পাপের শান্তিদাতা," তাহা কি সহজ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না?

তবেই দেখুন সেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থাকিল, ক্রিয়েচ্ছা থাকিল, প্রেম থাকিল, ধর্ম্ম নিয়ম থাকিল, তাহা হইলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভৌতিক শক্তির ন্যায় জড় শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন। যে অর্থে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছাসম্পন্ন যিনি, তিনি পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত যোগ দিয়া বলিতে ইচ্ছা করে;—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

অর্থ—"অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী—এই মহৎ পুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাঁকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।"

সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

(ভারতী হইতে উদ্ধৃত)

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দু-সম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্ম্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুল্‌বুলের লড়াইয়ে যেমন পাখীতে পাখীতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয় পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধ করি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয় পক্ষীয় মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনও স্থির হয় নাই। কেবল ডুটো কথায় মিলিয়া বাঁওকষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎ পরিমাণ মাত্র স্থানের বেশী অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন চারি হাত জমির বেশী তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাজনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বলেন—এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কি! কারন, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র, সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লওনা কেন?—তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মত কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগ্লাস জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাৎ কি? আমি যেন বলপূর্ব্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম—কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটাত আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চ্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই—আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্ত্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিও না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর সমস্তই পথ—অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিও না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্য স্ফূর্ত্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ

ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা ও ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলঙ্কারশাস্ত্রসর্ব্বস্ব পদ্যরচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশে যদি মূর্ত্তি গড়া যায় ও সেই মূর্ত্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্ত্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্ত্তিটাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পলাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না—মনুষ্য প্রকৃতিরই এই ধর্ম্ম।

যেখানে চক্ষুর কোন বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারিদিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণ কাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম—তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না! কিন্তু আমি না কি স্বাধীন ভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেই জন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্ত্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য, বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস—ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে

পরিণত হউক্। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখ শান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস কর, অসীমে বিচরণ কর, পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, আচ্ছন্নকারী বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিও না। সূর্য্যকিরণের অধিকাংশই সৌর জগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ-পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্য্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্য্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভাল! মুক্ত সূর্য্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্র-বিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া লই—দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোট দেখি মনে তাহাকে বড় করিয়া লই—চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্ব্বতোরূপে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড় দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড় আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না—তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান, সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্ব্বে কিম্বা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এই জন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য বা অলক্ষ্য ভাবে সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে

করুন,আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে, এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে—কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্দ্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।—সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূল-কিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এই জন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে,অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্র-মণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য—এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মত বিশ্রাম-স্থল; শিশুর মত আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিরাম লাভ করি;—সেখানে সকল চেষ্টার অবসান, সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবল মাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্ব্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তুলা অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাঁহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়াই আবার তর্ক করিব কি! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন,আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেই দিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্ত্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্য-মাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে। এবং সেই জন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষা-চিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসীমতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার

উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (Realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধূলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে,—আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ কর, আমাকে স্পর্শ কর, আমাকে ভক্ষণ কর, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ কর। কিন্তু ভাব-প্রধান (Suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইসারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা গণ্ডী হইয়া না দাঁড়ায়; যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্য-স্বভাব বশতঃ সহজেই বলিতে পারে "আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি" তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দ্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোন আবশ্যক নাই;—কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

"চরণচ্ছায়ায় আছি" বলিতে গেলেই অমনি যে রক্ত মাংসের একযোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোন কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মত টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোন মহা পণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোন বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, এক যোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন! কিন্তু কবি যদি কেবল ইসারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশী ঝোঁক দিতেন; যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়াবুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গীর সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক যোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মত একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না—কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মত মুখ ও পদ্মের মত করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন উপায় থাকে না। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোন তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্ত্তি কল্পনা করেন না; কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্ত্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর একটি কথা। কতগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলঙ্কারশূন্য। অলঙ্কারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে

রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন্ একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে আছে—মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া নায়ক লান্‌স্‌লট্ কুমারী গিনেবীব্‌কে মহারাজের সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন—কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না; এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই, ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি—অবশেষে ভ্রম ভাঙ্গিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এই জন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া কোন মতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য্য হই, সুচতুর ব্যাখ্যার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্ম্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখি এবং তাহার চাক্‌চিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা, কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা ত ধর্ম্মের সহিত চালাকী করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্য্যেরা অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্ম্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়—ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক্ যদি কোন ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোন মতেই গৃহকার্য্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচ জনকে বলে গৃহকার্য্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। এক জন বালিকা যখন পুঁতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুঁতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না—তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমত পুঁতুল দুটিকে সত্যকার কর্ত্তা গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্য্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার এই

সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তি সাধন, আরেকটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য্য ভালরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুঁতুল লইয়া খেলা কর। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা কর। যতটা পার তাই ভাল, কারণ ইহা জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোন ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিস্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোন পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এই জন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাঁহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই!

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ-বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কি করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কি করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব*। হল্যাণ্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যাণ্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেই টুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিষ্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক— তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙ্গালী, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্য্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য— তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র, ইত্যাদি—এক কথায়, তিনি যে কত কি তাহার ঠিকানা নাই – কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা

* কাগজের যেমন ও পিট্ বাদে শুদ্ধ কেবল এ-পিট্-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না—সেইরূপ কোন সত্তারই গুণ-বাদে শুদ্ধ কেবল বস্তু-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। শাস্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতেছে যে, চিৎ এবং আনন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক গুণ এবং তাহার আধার-ভূত বস্তু সৎ তিন ধরিয়া "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই এক সত্য আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। সং

কাহাকে বলে তাহাও সে ভাল করিয়া জানে না)—শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে; ইহাতে ক্ষতি কি! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যে রূপ সত্য ইহাও সেই রূপ সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি—এই জন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি—ন্যায় দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙ্গিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কি করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান্ বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বই কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি "ভূমৈব সুখং" ভূমাই সুখ স্বরূপ, কোন সীমা কোন ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই—তা হইলে অনর্থক পর্য্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

GLEANING.

It is a blessed thought that there is a Sun for our souls, as well as for our bodies. That as that glorious globe of light and heat gave birth to all that is fair and beautiful and living on this earth of ours, and still sustains all the life, and is the unfailing spring of health, and comfort, and every form of loveliness; so God in Heaven beams upon the inner life of man, giving birth to all souls, and adorning them with every grace of virtue, with all the the beauty of holiness. Nor is it mere life and beauty, but active work and heroic deeds. The fruits no less than the flowers are ripened by His beams, and all our labour and success as well as our peace, and rest, and joy have come from Him. Whenever, therefore, our hour of darkness come, let us wait hopefully for His rising: if mists and clouds are round about us, let us be sure that His rays will melt them; if wintry cold and gloom in their season be our portion, let us keep on our stedfast round of duty in the orbit which He has fixed for us, and in due time the warmth and longer days of springtime and summer will come again, filling our hearts with joy and gladness. "In thee, O Lord, is the well of life, and in thy light shall we see light." "O send out thy light and thy truth, that they may lead me and bring me to thy Holy Hill."

C. Voysey.

প্রেমসূর্য্যোযদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং।
যাতি মোহতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতিতত্ত্বং বিমলং।